

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৮ মার্চ, ২০২২

৪৫ বর্ষ ১০ সংখ্যা ৭ মার্চ, ২০২২, সোমবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪২৮

ছাশা ও লুটের ভোটে তৃণমূলের জয়, দ্বিতীয় স্থানে ফিরে এল বামফ্রন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ মার্চ : পুরসভা ১৫-১-এর ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। কালনা পুরসভা ১৭-১, দাঁইহাট ১৪-০, কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৫, কংগ্রেস ৪, নির্দল-১, গুসকরায় ১৬-০ বোর্ড দখল করেছে। তৃণমূল কালনায় জয়ী হয়েছেন সিপিআই(এম) প্রার্থী শমিষ্ঠা নাগ। কাটোয়ায় ৪টি মেমারিতে ১ আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। ভোটে শতাংশের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে ফিরে এসেছে বামফ্রন্ট। ৬টি পুরসভাতেই একই চিত্র।

সলিল ভট্টাচার্যকে স্মরণ করলেন পরিবার পরিজন ও স্বজন বন্ধুরা



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : বর্ধমান জেলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব সলিল ভট্টাচার্যের পারিবারিক স্মরণসভা আজ লায়ন্স ক্লাবের তিনকোনিয়া সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। গান-কবিতা-আবৃত্তি ও কথায় স্মরণ করলেন তাঁর পরিবার পরিজন ছাত্র-ছাত্রী আত্মজন ও স্বজনেরা। স্মৃতি রোমন্থন করেন ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে সহযোদ্ধা মদন ঘোষ, অরিদম কোঙার, অমল হালদার

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, জহর সাঁই, দেবেশ ঠাকুর, প্রদীপ ঘোষ সহ অনেকেই। সঙ্গীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, চন্দা চট্টোপাধ্যায়, পূজন সেনগুপ্ত, আয়নার শিল্পী সহ শহরের বহু সঙ্গীতশিল্পী। প্রয়াত ভট্টাচার্যের কবিতা পাঠ করেন কবি কুশল দে। কবি নীলা করের শোকবর্তা পাঠ করেন মনামি ঘোষ। প্রয়াত সলিল ভট্টাচার্যের জীবনের বিভিন্ন তুলে ধরেন তাঁর কন্যা মৌসুমী মুখার্জী (ভট্টাচার্য)।

সমবায়ের আমানতকারীদের অবস্থান বিক্ষোভ, অবরোধ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ মার্চ : জমানো টাকা তহরুপ হ ও য. ১ য. কালনা-২ ব্লক কো-অপারেটিভ



এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ-এর আমানতকারীরা আজ অবস্থান- বিক্ষোভে বসেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চ ও সারা ভারত কৃষক সভার কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির যৌথ উদ্যোগে বরকপাড়ায় অবস্থানের পর কালনা-বৈচি সড়ক বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ করেন। অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ ‘সমবায় বাচাও মঞ্চের’ রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সমীর মুখার্জী, নবকুমার বাগ, অরূপ ব্যানার্জী, পীযুষ চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন কাজী নুরুল ইসলাম। বক্তারা বলেন, সমস্ত সমবায়ের বিধি উপেক্ষা করেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীদের স্বপ্ন পাইয়ে

দেওয়া হয়েছে। বিনা টেন্ডারে সংস্থার কাজ করানো হয়েছে। ফলে চরম অর্থ সংকটের মধ্যে পড়ে এই সংস্থা আজ বন্ধ। তার ফলশ্রুতিতে এই সংস্থার দুটি ব্যাংকিং শাখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বহু আমানতকারী তাদের গচ্ছিত অর্থ ফেরত পাচ্ছে না। বন্ধ হওয়া সমবায়ের ১৫ জন কর্মচারীদের বেতন বন্ধ। তৃণমূল পরিচালিত এই সংস্থার পরিচালন কমিটি ব্যাপকভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে। এটা কোনো ভবেই মানা যাবে না। মানুষের টাকা ফেরতের জন্য যতদূর যেতে হয়, তাঁরা যাবেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া সমবায় এবং হিমঘর খোলার জন্য যা করার করবো।

স্থানীয় তৃণমূল নেতার হুমকি ও প্ররোচনায় আত্মঘাতী ছাত্রী : উত্তাল শহর



বাড়ির দেওয়ালে প্ররোচনা সৃষ্টিকারী সেই দেওয়াল লিখন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : ২৭ নং ওয়ার্ডের ছাশা ভোট জেতা কাউন্সিলর বসিরুদ্দীন ওরফে বাদশার প্ররোচনায় প্রতিবাদী যুবতী তুহিনা খাতুনের আত্মঘাতী মৃত্যুতে রাজ্য ও রাজনীতি তোলপাড়। প্রতিবাদী যুবক

আনিস খান খুনের সঙ্গে অনেকটাই মিল। আনিস খান-কে শাসক ও পুলিশ মিলে খুন করেছে। তুহিনার আত্মঘাতী নিজের দলের কাউন্সিলরের তোলাবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে বাদশা সহ ১৪

জনের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করেছে। পুলিশ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মূল আসামি সহ অন্যান্যরা পুলিশের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এর প্রতিবাদে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই কংগ্রেস, আওয়াজ সহ বিভিন্ন সংগঠন পথে নেমেছে। থানায় ডেপুটেশন, মিছিল, বিক্ষোভ সভা সহ জোরদার আন্দোলন চলছে। সংসদের বিরোধী দলের নেতা অধীর চৌধুরী ৭ মার্চ আসছেন। রাজ্য ছাড়িয়ে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হচ্ছে।

আনিস খানের মত আবার এক প্রতিবাদী মেয়েকে মরতে হলো। সদ্য জেতা শেখ বসিরুদ্দিনের তীব্র মানসিক অত্যাচারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে তুহিনা খাতুন (১৮)। তাঁর বাবা যুনাই শেখও শাসক দলের সমর্থক ছিলেন। এবারেও ভোট দিয়েছে তৃণমূলকে। মৃত্যুকে ভোট দিতে দেয়নি। সে এবার প্রথম ভোটার ছিল। সে একজন ছাত্রী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বসিরুদ্দীন গতবারও কাউন্সিলর ছিলেন।
—এরপর চারের পাতায়

আনিস, তুহিনা-র হত্যাকারীদের শাস্তি ও বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ মার্চ : হাওড়ার আমতার প্রতিবাদী ছাত্র আনিস খান-এর খুনের প্রতিবাদে, আনিস খানের খুনীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে আন্দোলনরত মিনাক্ষী মুখার্জী সহ ষোলজন ছাত্র-যুব নেতৃত্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ও বর্ধমানের ২৭ নং ওয়ার্ডে পুর নির্বাচনের আবহে সন্ত্রাস, হুমকি, ভীতিপ্রদর্শনের ফলে আত্মহননে প্ররোচনাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে শহরজুড়ে একাধিক কর্মসূচি হয়েছে। ৪ মার্চ বিকেলে বর্ধমানে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই ও সারা ভারত মহিলা সমিতির উদ্যোগে মিছিল ও থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। ৬ মার্চ আনিস খানের হত্যাকারী গ্রেফতার ও শাস্তির দাবির পাশাপাশি আন্দোলনরত মিনাক্ষী মুখার্জী সহ ছাত্র-যুব নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলে। কার্জন গেট থেকে মিছিল ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই, রানিগঞ্জ বাজারে পথসভা ও অনুষ্ঠিত হয়।



আওয়াজ-এর উদ্যোগে বর্ধমান পৌর এলাকার ২৭ নং ওয়ার্ডের ছাত্রী তুহিনা খাতুনের আত্মহননের প্ররোচনা সৃষ্টিকারী স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে বর্ধমান থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক সাইদুল হক, জেলা সম্পাদক নুরুল হক প্রমুখ। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্বস্থলী আঞ্চলিক

কমিটির উদ্যোগে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চালানো হয়। খুব সম্প্রতি যুদ্ধবিক্ষান্ত ইউক্রেন থেকে ডান্ডারি পড়তে যাওয়া আকিব মোহাম্মদ কোনরকমে জীবন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। এদিন যুব কর্মীরা পূর্বস্থলী-২ ব্লকের চুপি গ্রামে আকিবের বাড়িতে স্বাক্ষর সংগ্রহে যায়। সানন্দে আকিব মোহাম্মদ স্বাক্ষর করে দেনই, তার সঙ্গে তার বাবা আমজাদ শেখ এবং মা সুলতানা বেগমও স্বাক্ষর করেন।

শিলাবৃষ্টিতে পেঁয়াজ ও পেঁয়াজফুলের ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১ মার্চ : সম্প্রতিকালে শিলাবৃষ্টিতে পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ ফুলের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নিম্নচাপের বৃষ্টির কারণে এবছরের শীতকালীন পেঁয়াজ চাষ বিলম্বে হলেও গাছে পেঁয়াজের গুটি বাঁধতে শুরু করেছে। শিলাবৃষ্টিতে পেঁয়াজ গাছ ভেঙে পড়ে পচন শুরু হয়েছে। সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে পেঁয়াজের ফুলের। যা থেকে আগামী বছরের পেঁয়াজ চাষের জন্য বীজ তৈরি হয়। তাই পেঁয়াজ ফুল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আগামী বছরে পেঁয়াজ বীজের সংকট তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ ফুলের ক্ষতির কথা মেনে নিয়েছেন কালনা মহকুমা সহ কৃষি আধিকারিক ডঃ পার্থ ঘোষও। তিনি বলেন, এই এই সময় শিলাবৃষ্টি পেঁয়াজ ও পেঁয়াজ ফুলের বেশ খানিকটা ক্ষতি করবে। কৃষিপথান মহকুমাগুলির মধ্যে কালনা তার অন্যতম। নদীমাতৃক এই মহকুমায় মাটির রকম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়। সেই ফসলগুলির অন্যতম হল আলু, পেঁয়াজ, ধান ও বিভিন্ন সবজি চাষ। প্রতিবছরই কালনা মহকুমা কমবেশি ৪ হাজার ৭৩০ হেক্টর জমিতে শীতকালীন ‘সুখ সাগর’ প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। এই মহকুমার ব্লকওয়ারী পেঁয়াজ চাষ হয় কালনা-১ ব্লক এক হাজার ১২০ হেক্টর, কালনা-২ ৭০০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-১ ১ হাজার ৬০০ হেক্টর, পূর্বস্থলী-২ ১ হাজার ৮০ হেক্টর এবং মন্ডেশ্বর ১৫০ হেক্টর জমিতে। এই পেঁয়াজ চাষের পাশাপাশি একই সাথে পেঁয়াজের ফুলের চাষও করা হয়। যাতে আগামী বছরে পেঁয়াজ চাষ করার জন্য পেঁয়াজ বীজ কৃষকরা নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারেন। বহুজাতিক সংস্থাগুলি অন্যান্য



ফসলের বীজ তৈরি করে কৃষকদের কাছে ইচ্ছামত দামে বিক্রি করতে সক্ষম হলেও এখনো পর্যন্ত পেঁয়াজ বীজ-এর ক্ষেত্রে পারিনি। এখনো পর্যন্ত পেঁয়াজ বীজ তৈরি করার কাজ কৃষকরা নিজেরাই করে থাকেন। পূর্বস্থলীর পিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানগ্রাম এবং বাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক পেঁয়াজ ফুলের চাষ হয়েছে। শিলাবৃষ্টিতে সেখানকার পেঁয়াজ ফুল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। কি করবেন ভেবে কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না।

নতুন চিঠি

৭ মার্চ, ২০২২

পুরনির্বাচন ও গণতন্ত্রের দুর্দশা

পশ্চিমবঙ্গে ১০৮টি পুরসভায় নির্বাচন হয়ে গেল—জনগণের মতদানের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, বুথকে বিরোধী এজেন্টশূন্য করে, বহিরাগত দুষ্কৃতী দিয়ে ব্যাপক ছাপ্পার সু-বন্দোবস্ত করে ‘শান্তিপূর্ণ’ নির্বাচন হল। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ‘রা’-কারার সাহসটুকুও দেখালো না। একমাত্র পুরসভা তাহেরপুর, যেখানে পুলিশ শাসকদলকে মদত দেওয়ার মতো নিচে নামেনি, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বামদের বেছে নিতে পারলেন। পুলিশ তার প্রশাসনিক কাজ নিরপেক্ষভাবে করল বলে ফল বেরফেলার পরই বদলি করা হল সেই থানার ওসিকে। অর্থাৎ গণতন্ত্রকে চিতায় তুলে স্বৈরতন্ত্রকে, বিরোধীশূন্য একাধিপত্যকে, কায়ম করার চেনা পথই বেছে নিলো তৃণমূল কংগ্রেস। গণমাধ্যম-কর্মীদের আক্রান্ত হওয়া, বিরোধী প্রার্থীর নিগ্রহ, ভোট কেন্দ্রে বহিরাগতদের তাণ্ডব, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের হিরণ্ময় নীরবতা—এসব এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। এবারের ভোটে যেটা অতিরিক্ত পাওনা—অধিকাংশ তৃণমূল সমর্থকও তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না। অধিকন্তু ক্ষমতাবানের সন্ত্রাসে শাসকদলের কর্মী কলেজছাত্রী তুহিনা খাতুন মানসিক চাপ নিতে না পেরে আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হলো বর্ধমানে।

অর্থাৎ তৃণমূলের শাসনে মায়ের চোখে জল, শাসকের পায়ের তলার মাটি আলগা, মানুষ ‘তাহি তাহি’ রবে ফুঁসছে। মিডিয়াকে তাই ঢোক গিলেই ‘সুবজ ঝড়’ বলতে হচ্ছে। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গ ‘জয়’ করেও তৃণমূলের ‘ভয়’ যাচ্ছে না, মানুষকে বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনই শোচনীয় জনবিচ্ছিন্নতা! ফলে স্বৈরতন্ত্রের চেনা পথেই হাঁটতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। তা না-হলে রাতদুপুরে নিজের বাড়িতে কেন খুন হতে হবে আনিস খানের মতো একজন প্রতিবাদী যুবককে? কেনই বা সে অন্যায়ের প্রতিবাদে ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন করতে গিয়ে জেল হাজতে থাকতে হবে মীনাফী মুখার্জীর মতো ‘আগুন পাখি’ যুবনেত্রীকে? কেন সরকারি অসহযোগিতায় দিনের পর দিন জামিন পাবেন না যুবকমীর?।

আসলে বিরোধী আয়নায় নিজের মুখ দেখার সাহস রাখে গণতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্র সে আয়নাটাই ভেঙে ফেলে, যাতে নিজের রক্তাক্ত নখ-দাঁতের ছবিটি তাকে দেখতে না হয়। নরেন্দ্র মোদীর বিরোধীশূন্য ভারতের ডাক আর মমতা ব্যানার্জীর বিরোধীশূন্য পশ্চিমবঙ্গ গড়ার সংকল্প আসলে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। তাই কৌতুক বোধ হয় যখন ‘চিত্তন’ বৈঠকে বিজেপি বলে তৃণমূলই কৌশলে ছাপ্পা দিয়ে বামদের ভোট বাড়িয়েছে। যেন তৃণমূল বিজেপির নয়, বামদের স্বাভাবিক মিত্র। আসলে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় দুটি দলেরই স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। তাই ‘জয় শ্রীরাম’ বা ‘লক্ষ্মীকান্তাণ্ডার’-এ আর টিড়ে ভিজছে না। ভোট ভাঙাতির বাজারেও বামদের ভোট-শতাংশ উধ্বমুখী। কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন শাসকদল যে জনকল্যাণ চায় না, গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করে না, মানুষকে বিশ্বাস করে না, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চায় না, এটা বুঝতে আজ আর মানুষকে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে বা নিউজ চ্যানেল ঘোরাতে হচ্ছে না। মুর্খরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। হিটলার-মসোলিনীর মতো মোদী-মমতার ‘রক্ত আঁখি’ ও আগামী দিনে ‘শিশুপাঠ্য কাহিনিতে’ মুখ ঢাকবে, কারণ মানুষই শেষ কথা বলে।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ : পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

বিশ্ব উন্নয়ন ও কৃষিশ্রমিক :

ভারতের কৃষিব্যবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অষ্টমপর্বের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন আর্থিক ক্ষতির দায় মূলত এদেশের কৃষককুলকেই বহন করতে হয়। কেন না, সরকারের দেওয়া ক্ষতিপূরণ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। চতুর্দশ পর্বের আলোচনা থেকেও দেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রতি, বিশেষত ভর্তুকির প্রশ্নে চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলির সরকারের তুলনায়, ভারত সরকারের ভূমিকার অসংবেদনশীলতা তথা বিমাতৃসুলভ আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের কৃষককুল বিশ্ব উন্নয়নজনিত কারণে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ক্ষয়ের দরুন যে সম্ভাব্য বিপুল সমস্যার সম্মুখীন, বর্তমান পর্বের আলোচনা সেই উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত।

ক্রমশঃবর্ধিত আদ্র-তাপ (humid heat—অর্থাৎ বাতাসে আদ্রতা এবং তাপ উভয়ের যুগপৎ উপস্থিতি) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে কিনা, এর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় বিজ্ঞানী অনুসন্ধান চালান। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১, Nature Communications নামক পত্রিকায় সেই অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হয়েছে। নানান মাত্রার তাপের দরুন,মূলত কৃষি এবং সহযোগী ক্ষেত্র ও নির্মাণশিল্পের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার ক্ষতির পরিমাণের এক হিসাব এই গবেষকেরা সংশ্লিষ্ট গবেষণাপত্রে হাজির করেছেন। সেই হিসাব তথা পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান পর্বের আলোচনা। পূর্বের বেশ কয়েকটি পর্ব জুড়ে আমরা কৃষক তথা দরিদ্র মানুষের উপর বিশ্ব উন্নয়নের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফলিগজি প্রদর্শিত বিশ্বব্যবস্থার তিনটি মূল সমস্যার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে এই বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত

শান্তনু কুমার ঘোষ

হয়েছে যে সমগ্র মানবসভ্যতা আজ জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থিক ও সামাজিক অসাম্য এবং ব্যবস্থাপনা (Governance) সংক্রান্ত ত্রিবিধ সমস্যায় সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। এবং একথা বলাই বাহুল্য যে সেই ভুল ব্যবস্থাপনার দায় সবচাইতে

পঞ্চদশ পর্ব

বেশি বহন করতে হচ্ছে দরিদ্র বিশ্ববাসীকেই। বিশ্ব উন্নয়নের সমস্যা ও এই ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থারই পরিণতি এবং এক্ষেত্রেও উদ্ভূত দায় কী নিদারুণভাবে মূলত ভারতীয় দরিদ্র কৃষি ও নির্মাণ শ্রমিকের উপর বর্তাচ্ছে এ লেখনি তারই স্মারক। সঠিক বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমেই কেবলমাত্র এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, এমনটাই বিজ্ঞানী তথা সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা।



আলোচ্য গবেষণাপত্রটি বিশ্বের মোট ১৬৩টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। বর্তমান উন্নয়নের স্তর সহ সম্ভাব্য ১ ডিগ্রি, ২ ডিগ্রি এবং ৪ ডিগ্রি বর্ধিত তাপমাত্রার দরুন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব তাঁরা মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের আলোচনা অনুসারে উন্নয়নের বর্তমান স্তরে, বিশ্বের সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশটির নাম ভারতবর্ষ (বার্ষিক ১০১ বিলিয়ন শ্রমঘণ্টা; জনপ্রতি ১৬২ ঘণ্টা); যদিও জনপ্রতি শ্রমঘণ্টা অপচয়ের নিরিখে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলি হল কাতার ও বাহরিন (৩০০ ঘণ্টা)। ২০০১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে সমগ্র বিশ্বে প্রতি বছর গড়ে ২২৮ বিলিয়ন ঘণ্টার সমপরিমাণ শ্রমশক্তির অপচয় হয়েছে; সবচাইতে বেশি ক্ষতির বছর হল ২০১৬ সাল (২৭৪ বিলিয়ন ঘণ্টা) এবং ২০১৯ সালের ক্ষতির পরিমাণ ছিল

২৭০ বিলিয়ন ঘণ্টা। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্যাপী শ্রমঘণ্টা ক্ষতির প্রায় ৪৪ শতাংশের দায় ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণিকে বহন করতে হয়। অন্য দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল—কাতার, বাহরিন, সৌদিআরব, কাসোভিয়া, ঘানা, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। অর্থাৎ মূলত এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকার শীর্ষে।

কিন্তু এতেই শেষ নয়। কেননা, কার্বন নিঃসরণ উপযুক্ত পরিমাণে হ্রাস না করা গেলে এবং বিজ্ঞানীদের অনুমান সত্য হলে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ কমপক্ষে ১ ডিগ্রি থেকে সর্বোচ্চ ৪ ডিগ্রি পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাব এই রকম : ১ডিগ্রি-৩৬২ বিলিয়ন ঘণ্টা; ২ডিগ্রি- ৫৪৭ বিলিয়ন ঘণ্টা; এবং ৪ ডিগ্রি- ১০৯১ বিলিয়ন ঘণ্টা। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের দায় কতটুকু? ১ডিগ্রি, ২ ডিগ্রি এবং ৪ ডিগ্রি বর্ধিত তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে

যথাক্রমে ১৫৬ বিলিয়ন ঘণ্টা, ২৩০ বিলিয়ন ঘণ্টা এবং ৪৩৭ বিলিয়ন ঘণ্টা; শতাংশের হিসাবে যা যথাক্রমে ৪৪, ৪৩ এবং ৪০। অর্থাৎ, যেকোনো পরিস্থিতিতেই, বিশ্বের মোট শ্রম - উৎপাদনশীলতার হ্রাসজনিত ক্ষতির মধ্যে ৪০-৪৪ শতাংশ ক্ষতির দায় ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির উপর বর্তায়। অথচ বিশ্ব উন্নয়নের কারণ যে উৎপাদন ও ভোগব্যবস্থা এবং তার সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী (উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত), সম্ভবত সেই বৃত্তের অনেক দূরে এঁদের অবস্থান।

ভারতের মোট জনসংখ্যার নিরিখে তাঁরা এখনও প্রায় ৬০ শতাংশ। স্বাধীন ভারতের সুবিধাভোগী ও বিত্তবানদের বিগত ৭৫ বছর ধরে সেবা প্রদানকারী এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শ্রমিক করে না রেখে মানবিক মূলধনে (Human Capital) পরিণত করা যেত কি? দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কখনও এমন ভাবনার কথাকে কি উল্লেখ পর্যন্ত করেছেন? উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানবিক মূলধনের ভূমিকা যথাযথভাবে বিবেচিত না হওয়ার ফল চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কেনন হতে চলেছে আগামীপর্বে সেবিষয়ে আলোকপাত করার ইচ্ছা রইলো।

শিক্ষায় পিপিপি মডেল : সরকারি শিক্ষার মৃত্যুঘণ্টা

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) বলতে বোঝায় দুই বা তার বেশি সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি এক ব্যবস্থাপনা। এই ব্যবস্থায় বেসরকারি পুঁজি সরকারি প্রকল্প/পরিষেবাগুলিতে নিয়োজিত হয় এবং তারপর পি পি পি চুক্তির মাধ্যমে করদাতাদের এবং সেবা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে মুনাফা অর্জন করে। ভারতে শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব ছেলে মেয়ে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী। শিক্ষা মৌলিক অধিকার। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হওয়া দরকার ৩০:১। সর্বস্তরের স্কুলশিক্ষার প্রসারে ও মানোন্নয়নে এখন রাজ্যে দরকার সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি। দরকার দ্রুত স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ। প্রয়োজন ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টি ও সরকারি ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়াবাদের বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা। গত দু'বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। লেখাপড়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর। এরকম সময়ে সমস্ত

শিক্ষা উপকরণ নিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো যখন একান্ত প্রয়োজন তখন রাজ্য সরকার পি পি পি মডেলে স্কুল প্রতিষ্ঠার খসড়া নীতি নির্দেশিকা বিভিন্ন বিভাগে পাঠিয়েছে। কী আছে এই খসড়ায়? গুরুত্বই বলা হয়েছে স্কুল শিক্ষা বিভাগ ২০১১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে, যার ফলে উচ্চমাধ্যমিকে নিবন্ধীকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১.৮ লাখ থেকে বেড়ে ১৬.৬ লাখে পৌঁছেছে। এই কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, রাজ্যে রয়েছে স্কুলশিক্ষার এক বিস্তৃত ক্রমবর্ধমান বাজার অর্থাৎ প্রভূত মুনাফার সুযোগ। দ্বিতীয়ত, সরকার ২৯০০ স্কুলকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করেছে ও প্রতি বছর মাধ্যমিকে প্রায় ১২ লাখ ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯.৫ লাখ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। এই তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষাবিভাগ বোঝাচ্ছে স্কুল-পরবর্তী উচ্চশিক্ষার বাজারও সুবিস্তৃত। অবশ্য প্রতি বছর গড়পড়তা সংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রটি স্বচ্ছ নয় বলে মনে হয়। কারণ ২০১১ সালে ১০ লাখ

দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তাই পরের বছর ১২ লাখ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তৃতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলনগুলিকে (প্রাকটিসেস) একীকরণ করার জন্য সরকার পি পি পি মোড চালু করতে চায়। আসল উদ্দেশ্য বেসরকারিকরণের জমি মসৃণ করা। চতুর্থত, যে কেউ কোন বোর্ড, কাউন্সিল, মাদ্রাসা বা স্বীকৃত অনুমোদনকারী সংস্থার অনুমোদন নিয়ে প্রাইভেট পার্টনার স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থাৎ সরকার পি পি পি মোডে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে প্রাইভেট পার্টনারকে সরকারি সম্পদের বিনিময়ে মুনাফা লাভের জন্য উদাত্ত আহ্বান করছে। পঞ্চমত, ফি বলতে সব ধরনের অর্থাৎ টিউশন ফি, শিক্ষা, প্রশাসন সমেত সব ধরনের খরচের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাইভেট পার্টনারের ফি বাড়ানোর যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া

হয়েছে। আশঙ্কা হয় শিক্ষা সাধারণের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাবে। দুঃখের কথা তা হতে চলেছে সরকারের প্রণোদনায়। ষষ্ঠত, স্কুলের প্রধানকে অধ্যক্ষ বা ডাইরেক্টর, পরিচালন সমিতিকে বোর্ড অফ ম্যানেজমেন্ট নামে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে শিক্ষায় ‘কর্পোরাইটেজেশন’-এর প্রবণতা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। সপ্তমত, প্রাইভেট পার্টনার বলতে কোনো ব্যক্তি, আইনসিদ্ধ কোম্পানি, সোসাইটি, পার্টনারশিপ ফার্ম, যৌথ ভেনচার, কনসোর্টিয়ামকে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে পার্টনারের সংজ্ঞাকে নমনীয় করা হয়েছে।

পি পি পি মোডে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। বাস্তব অভিজ্ঞতা হল নগণ্য সংখ্যক বে-সরকারি শিক্ষায়তন বাদ দিলে সরকারি শিক্ষায়তন গুণগত মানে অনেক উপরে। কী পদ্ধতিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে? প্রথমত, সরকার সময়ে সময়ে ইচ্ছুক ‘প্রাইভেট পার্টনারদের’ কাছে

স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ‘প্রস্তাবের অনুরোধ’-পত্র প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়ত, যে কোনো ইচ্ছুক প্রাইভেট পার্টনার এই মোডে স্কুল প্রতিষ্ঠার ‘বিডে’ অংশগ্রহণ করতে পারবে। তৃতীয়ত, একটি সরকারি কমিটি তৈরি করা হবে যে কমিটি পার্টনার নির্বাচন করবে। গুণগত মান ও আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে পার্টনার হতে ইচ্ছুকদের প্রস্তাব যাচাই করা ও নির্বাচন করা হবে। চতুর্থত, সরকার জমি, বাড়ি, পরিকাঠামোর যোগান দেবে। যখন প্রস্তাব প্রকাশিত হবে তখন শর্তসমূহ জানান হবে। পঞ্চমত, স্কুলের পরিকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে পার্টনার স্কুলের নির্ধারিত সময় বাদ দিয়ে শিক্ষা বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ল্যাব, ঘর ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে। অর্থাৎ সর্বোত্তম ব্যবহারের নামে প্রাইভেট পার্টনারের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই মোডে। পার্টনারের কী ভূমিকা থাকবে? প্রথমত, তারা প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করবে

—এরপর চারের পাঠ্য

মরমী শিক্ষক সলিলদার স্মরণে

অমল হালদার

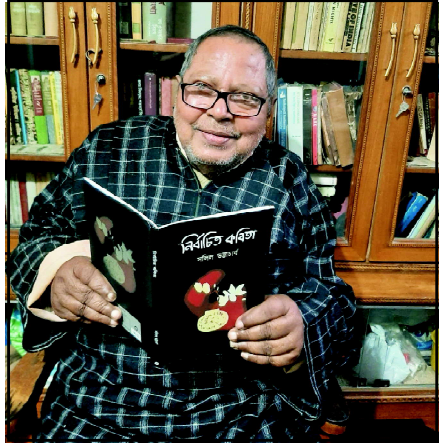
আমাদের পরিবার সহ সকলের অত্যন্ত প্রিয়জন সলিলদা চলে গেলেন। ছাত্র আন্দোলনের সূচনাপর্বে কিছুটা হাতেখড়ির পর প্রথম ভাগ পড়ানোর কাজটি তিনিই করেছিলেন। ১৯৭০ সালে সাঁইবাড়ির ঘটনার পর ‘বিকাশ মজুমদার’ ছদ্মনামে তিনি রায়না থানাতেই থাকতেন। কিছুকাল তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কমরেড নির্মলদার বাড়িতে বাঁধগাছায় থাকার পর পুলিশের সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তিনি মুক্তিপুরে কমরেড শক্তিপদ ঘোষ এবং গোপীনাথপুরে বাদশা মুন্সির বাড়িতে থাকা শুরু করেন। আমরা তখন শ্যামসুন্দর কলেজে পড়ি। কমরেড সলিল ভট্টাচার্যকে চিনতাম কিন্তু বিকাশ মজুমদার সম্পর্কে ধারণা ছিল না। আত্মগোপনে যে নাম পাল্টে দিতে হয় সে বোধ আমার ছিল না। আসলে সলিল ভট্টাচার্যকে চিনেছি '৬৭ সালে, কমরেড গোকুলানন্দ রায় রায়না কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী, শ্যামসুন্দরের সন্মিলনে দলুইদীঘী বাজারে একটি সভায় মাইক বিগড়ে যাওয়ায় খালি গলায় বক্তৃতা করেছেন। ২০০ জন শ্রোতার মধ্যে আমিও ছিলাম। প্রথমে বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী গান ধরলেন, “কৃষককে কি অন্ধ কারায় বেঁধে রাখা যায়, হেঁই সামালো ধান হে” ইত্যাদি পাঁচটি গানের পর কমরেড সলিল ভট্টাচার্যের বক্তব্য শুরু, আজও মনে আছে খাদ্য আন্দোলনের শহিদ কমরেড নুরুল ইসলাম, আনন্ত হারিত দিয়ে শুরু তার মাঝে অনেক কথা। কখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সুকান্তের কবিতা, যেমন আবেগ তেমনি শ্লেষ তীক্ষ্ণ যুক্তিগুলির সমন্বয়ে খালি গলায় এক ঘন্টার বক্তৃতা আমাদের মতো স্কুলের ছাত্রদের এককথায় আটকে দিয়েছিল। আমরা প্রায় ৮/১০ জন ছাত্র এই বক্তৃতা শোনার পর তাঁর গভীর জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সত্যি কথা হলো তাঁর ধারালো বক্তৃতার অনেক কিছুই সেদিন বুঝতে পারিনি। সভার শেষে আমার মামা শক্তিপদ রায়চৌধুরীর বাড়িতে রাত্রি বাস করেছিলেন। তাঁদের আতিথ্যের অনেকটাই ভার ছিল আমার উপর, সেদিন ছিল খুবই আনন্দের দিন। রাত্রি ৮টার পর শুরু হলো সংগীতের আসর, কমরেড অজিত পাণ্ডের পর গান ধরলেন কমরেড সলিল ভট্টাচার্য, তারপর রায়নার শওকত মোল্লা। রাত্রি ১১টার পর খাওয়া-দাওয়া। অনেকদিন হয়ে গেল আজও সেই রাত্রিতে কমরেড সংকটতারণ মণ্ডলের আবৃত্তি, কমরেড সলিল ভট্টাচার্যের আবৃত্তি ও গান আর অজিত পাণ্ডের গণসংগীত যেন আজও কানে বাজে। সকালে বাসে তুলে দিলাম, তাঁরা রওনা দিলেন রায়না বাজারে অন্য এক সভায়।

কথাগুলি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে কমরেড সলিল ভট্টাচার্য আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন। মজা হলো একদিন যখন শ্যামসুন্দর কলেজে এস.এফ.আই সংগঠনের সাথে যুক্ত, ৭০ সালে কলেজ সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ছাত্রপরিষদের পক্ষ থেকে ক্লাসের অভ্যন্তরে বক্তৃতায় প্রতিদিনই হেঁচট খেতাম। সেদিন ওরা বললো দেখ স্বাধীনতা হবার পরও কেন ওরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের আগে স্বাধীনতার কথা বলবে, তাহলে কি আমরা স্বাধীন নই? ছাত্রপরিষদের বেশ কয়েকজন নেতা খুবই ভালো বক্তৃতা করতেন, কেউ কেউ পরীক্ষা না দিয়ে দীর্ঘদিন কলেজে রাজনীতি করতেন স্বাভাবিকভাবে আমাদের পক্ষে কলেজের অভ্যন্তরে ওদের সঙ্গে বক্তৃতায় পালা দেওয়া কঠিন ছিল। সেই সময় আমাদের প্রয়োজন ছিল প্রাক্তন ছাত্রনেতা এবং রাজনীতিতে পাণ্ডিত্য আছে এমন একজন শিক্ষাগুরু। আমার শিক্ষক ও পাঠির নেতা সংকটতারণবাবু আমাদের পাঠালেন কমরেড বিকাশ মজুমদারের কাছে, তিনি কয়েকদিন যুক্তিপুরে কমরেড শক্তিপদ ঘোষের বাড়িতে ছিলেন। আমরা সংকটতারণবাবুর চিঠি নিয়ে হাজির হলাম। তিনি সবটা শুনে আমাদের রাজনৈতিক ক্লাস শুরু করলেন। মনোযোগী ছাত্রের মতো আমরা নোট নিতাম। সাতদিন শিক্ষা গ্রহণে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুব বেশি বাড়েনি কিন্তু সেই শিক্ষাতেই অকাট্য যুক্তি নিয়ে ছাত্রপরিষদকে কার্যত ধুয়ে দেবার কাজ শুরু হয়ে গেল।

চিঠি নিয়ে যেদিন গোলাম আমি তো অবাক, ইনি তো সলিল ভট্টাচার্য। তিনি আমার মুখচোখ দেখে একান্তে বললেন, “আমার আসল নামটা সকলের কাছে বলবে না।” সাতদিন যে নোট করেছিলাম সেইগুলি আউড়ে কার্যত বাজিমাত, তারপর উনি গোপীনাথপুরে বাদশা মুন্সির বাড়ি গেলে সেখানেও ক্লাস করতে যেতাম। সেই সময় তিনি কয়েকটি বই দেন এবং পড়াশুনা করতে উৎসাহিত করেন। সেখানেই তিনি বললেন

তোমাদের পার্টি কর্মসূচি নিয়ে ক্লাস নেব, আগামী পরশু থেকে শুরু হবে সেদিনই তোমাদের কর্মসূচির বই দেওয়া হবে। আমি তখনও কর্মসূচির বই দেখিনি, কিন্তু একটা ভাবনা শুরু হলো যে কর্মসূচি নিয়ে আবার ক্লাস কি? আমাদের কর্মসূচি হলো বিপ্লব করতে হবে, তার জন্য আবার ক্লাস। যাইহোক বই নিয়ে ক্লাস শুরু হলো, প্রতিদিন ৩ ঘন্টার ৪ দিন ক্লাস করার পর সামান্য কিছুটা বুঝতে পারলাম। উনি বারবার বললেন, এটাই যথেষ্ট নয়, নিজের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে মার্কসীয় পুস্তকগুলি বারে বারে পড়তে হবে। বলা যায় তত্ত্বগতভাবে নিজেকে উন্নত করার সেটাই ছিল সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

এরপর কলেজে পড়তে পড়তে আমিও আসামী হলাম। পুলিশের দাপাদাপির কারণে ভিন রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হলাম। দীর্ঘদিন পর আমার



নিজ গ্রাম হাটশিমুলে দেখা হলো। আজও মনে পড়ে হাটশিমুলে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি যাত্রাপালা ‘রক্তে রোয়া ধান’ মঞ্চস্থ হয়, সংকটহরণবাবু সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন। তখন গ্রামেও যাত্রাশিল্পে মাইকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যাত্রার শুরুতে রবি ঠাকুরের ‘দুই বিঘা জমি’ নেপথ্যে থেকে আবৃত্তি করেছিলেন, আজও মনে আছে যেন নাটকের জন্য একটা মনোমুগ্ধ পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে মধুদা (রঞ্জিত মুখার্জী) মনোদার (মনমোহন ঘোষ) সাথে আবৃত্তি নিয়ে আলোচনা হতো। মনোদা বলতো ভোরবেলায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষমর্দিনীর মতো যেন কণ্ঠ ভেসে এসেছিল।

১৯৭৭ সালের পর নতুন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক কাজের ধারার পরিবর্তন হয়ে গেল। প্রকাশ্যে কাজ শুরু হলো। ছাত্র সংগঠন থেকে অব্যাহতি পাবার পর স্থানীয়ভাবে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হলাম, মুখ্যত রায়না থানা এলাকাতেই কাজের ধারা সীমাবদ্ধ ছিল। কমরেড রামানারায়ণ গোস্বামী রায়না এলাকার বিধায়ক ছিলেন। শুধু বিধায়ক নন, এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। ব্যক্তিগতভাবে আমার ও কমরেড উদয় সরকারের প্রতি তাঁর একান্ত দৃষ্টি ছিল। কৃষক সংগঠনে কাজের জন্য নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে পার্টির কাজেও দায়িত্ব বাড়ল। কমরেড নির্মল ঘোষ বাঁধগাছা বাসা ছেড়ে সলিলদার বাড়ির সামনেই বাড়ি তৈরি করলেন। আমিও '৮৭ সালে বর্ধমানের বড়নীলপুর মোড়ে বাসা ভাড়া নিলাম। সময়টা উল্লেখ করলাম এই কারণে আলোচ্য দিনগুলি ছিল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন মোটর সাইকেলে রায়না থানায় নানাবিধ কর্মসূচি করে রাত্রি ৯টা নাগাদ সলিলদার বাড়িতে পৌঁছে যেতাম। উষা বৌদি কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করতেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হতো। তিনি প্রতিদিন কিছু বই দিতেন, সেই বই পড়ার পর কার্যত মাস্টারমশাইয়ের মতো পড়া ধরতেন, বুঝতে না পারলে তিনি বুঝিয়ে দিতেন। শুধু রাজনীতি নয়, রবীন্দ্রনাথ থেকে সমরেশ বসু কিছুই বাদ যেতো না। প্রায় ১২ বৎসর সপ্তাহে অন্তত চারদিন এই রাজনৈতিক আড্ডা বা চর্চায় নিজেকে সমৃদ্ধ করার জীবনে একটা বড় সুযোগ এসেছিল। রাজনৈতিক বিষয়ে পড়াশুনার আগ্রহ সৃষ্টিতে তাঁর এই অবদান ভুলে যাওয়া যায় না। যেকোনো রাজনৈতিক কর্মী এই ধরনের সাহচর্য পেলে নিজেকে গড়ে তোলার পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়। দায়িত্ব বেড়ে যাবার পর ক্রমশ প্রাত্যহিক যোগাযোগ ক্ষীণ হতে থাকে। কিন্তু তিনি খোঁজখবর নিতেন, আমিও কখনো কখনো দেখা করতে বাড়িতে যেতাম। পরে কোভিড-১৯ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াত কমে যায়। সলিলদা চলে গেলেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। মনে মনে হিংসে হতো কারণ ওই শক্তি আমাদের নেই। এখন তাঁর স্মৃতি নিয়েই আমরা বেঁচে থাকব। আমাদের শিক্ষিত করার তাঁর এই উজ্জ্বল প্রয়াস যেন অনলিত হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

সলিলদাকে যেভাবে বুঝেছি

অরিন্দম কোণ্ডার

বিশ শতকের ছয়ের দশক। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মহাবিকর্ক। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিতর্ক আবার পাঁচের দশক থেকেই। ১৯৫৯-৬২ সালে চীনের সঙ্গে সীমানা নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ। দেশে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচার। জরুরি অবস্থা। কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ। অনেকে জেলে, আমিও জেলে। সেই সময়ে ১৯৬৪ সালে হুগলি জেলা থেকে বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে আসেন ছাত্রনেতা সলিল ভট্টাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য। আগেই, ১৯৬০ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। আমার সঙ্গে সলিলদার ঘনিষ্ঠতা ১৯৬৭ সাল থেকে। তখন নতুন করে ছাত্র সংগঠন, যুব সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলছিল। ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সলিলদা হন অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক। আমি রাজ্য কাউন্সিল সদস্য। ১৯৬৯ সালে সংগঠনের বর্ধমান জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সলিলদা সম্পাদক ও আমি অফিস-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হই।

সলিলদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার পরিচয় সলিলদার লেখা থেকেই দেওয়া যেতে পারে। সলিলদা লিখেছেন, “আর্থিক সংগতি এবং সময় না থাকার ফলে প্রথম সম্মেলনের (যুব ফেডারেশনের) প্রতিবেদন ছাপানো যায়নি বা প্রতিনিধিদের দেওয়া যায়নি। এই লিখিত প্রতিবেদনের কোনো কপি আমার কাছে নেই। যদি জেলার কোনো স্তরে কারুর কাছে থেকে থাকে (জানি না অরিন্দম কোণ্ডারের কাছে আছে কিনা), তাহলে সেটি একটি মূল্যবান নথি হয়ে থাকবে।” (বর্ধমান জেলার যুব আন্দোলন : প্রাসঙ্গিক কথা) এই প্রতিবেদনটি আমার কাছেই আছে।

২০১৯ সালে সলিলদা লেখেন, “প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে প্রত্যেক বছর আমাদের কন্যা মৌসুমির জন্মদিনে নিরুপম এবং অনেক বন্ধুবান্ধব হাজির হলে আমাদের বাড়ির ছাদে রান্নাবান্না করতে হতো। উষা (স্ত্রী) মাটির উনুন জ্বালিয়ে এই রান্নার কাজে আমাকে সাহায্য করতো। নিরুপম, মদন (ঘোষ), সুশাস্ত (চিনে) সামন্ত পারিবারিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করতো। এই প্রসঙ্গে অরিন্দম কোণ্ডারের (মন্টু)-র কথা ভুলতে পারি না। প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট তারিখে মাসোহারার মতো আর্থিক সাহায্য দিত। এটা তার নিজস্ব রোজগার থেকেই দিত। আমার অনেক কুণ্ঠা থাকলেও তার এই অকুপণ দান আমি ভুলতে পারি না।” (একটি নক্ষত্র আসে) ২০১৯ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সর্বভারতীয় নেতা নিরুপম সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা সলিলদার নিবন্ধে এমন উল্লেখ আছে। নিরুপম

সেন প্রয়াত হন ২০১৮ সালে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সলিলদা প্রথম থেকেই আমৃত্যু (১৯৬৪-২০২২) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সভ্য ছিলেন।

সলিলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আমৃত্যু থেকে গেছে। তাঁর সঙ্গে সর্বশেষ দেখা করি ২০২১ সালের শেষদিকে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির বর্তমান সভাপতি স্বর্ণেন্দু দাস ও সম্পাদক অয়নাংশু সরকারকে সঙ্গে নিয়ে। তখন তিনি পুরো চলচ্ছশক্তিহীন ও প্রায় বাকশক্তিহীন। আমি যতটুকু সলিলদাকে বুঝেছি, তাতে মনে হয়েছে



চেয়ারে বসে সলিল ভট্টাচার্য। যুব ফেডারেশনের পত্রিকা তুলে দিচ্ছেন স্বর্ণেন্দু দাস ও অয়নাংশু সরকার। সঙ্গে রয়েছেন অরিন্দম কোণ্ডার ও সুখেন্দু দে।

তাঁর যেমন বহু বিস্তৃত যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল তেমনি আবার বিপুল আবেগ ছিল। কখনো কখনো এই যোগ্যতা ও দক্ষতা আর আবেগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়নি। লক্ষ্য সামনে রেখে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে ধৈর্য ধরে একাগ্রতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় খামতি হয়েছে। সলিলদা ছাত্র-যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন, কবিতা আবৃত্তি করেছেন, গান গেয়েছেন, অধ্যাপনা করেছেন। সাবলীলভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন ও লিখেছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনি নজর কাড়তে পেরেছেন। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তিনি কম-বেশি একটি স্তর পর্যন্ত যেতে পেরেছেন যেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সেই স্তরকে অতিক্রম করে যেতে পারতেন। তাঁর সেই যোগ্যতা ও দক্ষতা ছিল আর এইখানেই আমাদের আক্ষেপ। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর কথাতেই বলি—

পরলোক, পুনর্জন্ম-বিশ্বাসের কায়হীন ছায়া ঘিরে যারা ভাবে অজন্মার আকাল জুড়ে প্রলয়ের ঢাক আমাদের রঙ্গমঞ্চ, নৃত্যকলা, কবিতা-সঙ্গীতভরা চিত্রলিপি মুছে দেবে ধ্বংসের মাতানে, অসুরের যজ্ঞশালায় তাণ্ডবে তখনই ভাঙা বৃকের পাঁজর থেকে তোমার সৃজনের গান কলস্রনা তটিনীর মতো বলে ওঠে তুমি আছে, তুমি আছে। (একটি স্মৃতি, একটি সৃজন)



১ মার্চ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তারাবাগ অতিথি নিবাসের প্রেক্ষাগৃহে ‘বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান সংস্থা’-র উদ্যোগে গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘বাংলার মন্দির, মসজিদ, টেরাকোটা ও বর্ধমান’ গ্রন্থের প্রকাশ অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক গৌতম সেনগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষেণের অধিকর্তা শুভ মজুমদার, এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষে অধ্যাপক জগৎপতি সরকার ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষে অধ্যাপক অলক চক্রবর্তী এবং গ্রন্থের সম্পাদক গিরিধারী সরকার প্রমুখ।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ‘স্বজন’ আয়োজিত সর্বভারতীয় কাব্য ও সাহিত্য সম্মেলনে কবি শঙ্খ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করছেন কবি অরবিন্দ সরকার। ‘স্বজন’ সংস্থার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি হয় কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল ৫৫, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতায়। অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক সাহিত্যপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন।

হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৪ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হস্তশিল্প মেলার উদ্বোধন হল বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের আয়োজনে এই মেলার উদ্বোধন করেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার হস্তশিল্পীরা মেলায় স্টল করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন নদ-নদীর নামে মেলার স্টলের নামকরণ করা হয়েছে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২১ হাজার ৫০৮ জনকে হস্তশিল্পীর পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কুটির শিল্প হারিয়ে গিয়েছিল।



সেইসব শিল্পকে চাঙ্গা করে আর্থিক বিকাশের জন্য মেলার সূচনা হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের অধিকর্তা দেব্যানী দত্ত। বিধায়ক, সভাপতি, এবং আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। মেলায় ৯৫০ জন হস্তশিল্পী মেলায় স্টল করেছেন। মেলা চলবে ২০ মার্চ পর্যন্ত।

মস্তেশ্বরে কৃষক নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ মার্চ : সিপিআই(এম)-এর মস্তেশ্বর এরিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য তথা সর্বক্ষণের কর্মী ও কৃষক নেতা সেখ আব্দুল হামিদ (৬৫)-র জীবনাবসান হয়েছে। গতকাল রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পাতুন গ্রামের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে মস্তেশ্বরের ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ওসমান গনি সরকার, মস্তেশ্বরের বিডিও গোবিন্দ দাস সহ অন্যান্য নেতৃদ্বন্দ্ব। ১৯৭৮ সালে তিনি পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৮৩-১৯৮৮ সালে মস্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। সমবায় আন্দোলনেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন তিনি দেনুড় শাখা সম্পাদক ও তৎকালীন মস্তেশ্বর-৩নং লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৭ সাল থেকে



মস্তেশ্বর এরিয়া কমিটির সদস্য এবং ওই বছর থেকেই আমৃত্যু মস্তেশ্বর ব্লক কৃষক সভার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টির পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন শোকবাতীয় জানান, হামিদদার মৃত্যু জেলা কৃষক আন্দোলন ও মস্তেশ্বর পার্টির বড় ক্ষতি হয়ে গেল। অচিন্ত্য মল্লিক, অমল হালদারও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

গৌরী মুখার্জীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ মার্চ, কালনা : শহিদ সুশোভনের মা গৌরী মুখার্জী (৮১) প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বার্ষিক্যজনিত কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানান অঞ্জু কর। শোক মিছিল করে তাঁর মরদেহ এরিয়া কমিটি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিনই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।



স্থানীয় তৃণমূল নেতার হুমকি

—প্রথম পাতার পর

তাঁর তোলাবাজিতে মানুষ অতিষ্ঠ। এলাকার সমাজসেবী মোক্তার শেখ কয়েকবার নির্বাচন কমিশনের কাছে জানালেও ফল পাননি। জয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে তুহিনার বাড়িতে বোমাবাজি, আক্রমণ করে বসিরঙ্গীদের দলবল। বাড়িতে বাবা ছিলেন না। মা আগেই মারা গেছে। তার ওপর এই মানসিক অত্যাচার। আবার হবে জেনে ভয়ে একটি ঘরে গলায় দড়ি নেয়। বাড়িতে অন্য দুই বোন কিছুই টের পায়নি। এলাকার মানুষ বসিরঙ্গিনের শান্তির দাবিতে পুলিশের কাছে ইনসাফ চাইছে।

মানাবে। পূর ভোটের আগে এলাকার সমাজসেবী মোক্তার শেখ কয়েকবার নির্বাচন কমিশনের কাছে জানালেও ফল পাননি।

জয়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসে তুহিনার বাড়িতে বোমাবাজি, আক্রমণ করে বসিরঙ্গীদের দলবল। বাড়িতে বাবা ছিলেন না। মা আগেই মারা গেছে। তার ওপর এই মানসিক অত্যাচার। আবার হবে জেনে ভয়ে একটি ঘরে গলায় দড়ি নেয়। বাড়িতে অন্য দুই বোন কিছুই টের পায়নি। এলাকার মানুষ বসিরঙ্গিনের শান্তির দাবিতে পুলিশের কাছে ইনসাফ চাইছে।

রত্না রশীদ

ক'দিন যাবৎ বেশ নাচন-কোদন, আবীর খেলা, মুখমিষ্টির মোচ্ছব, বুথভিত্তিক মাংস-মদের দেদার ফোয়ারা—বেছে বেছে বিরোধী বাড়িতে সদলে চড়াও—দরজায় লাথি, ছমকি, বোম ফাটিয়ে উল্লাস; এগুলো লিখে ফেলা গেলো। যেগুলো বর্ণে আঁটে না সেই অশ্রাব্য গালিগালাজ, শারীরিক অশ্লীল ইঙ্গিত, এগুলো আর কী করে লিখে বোঝাবো! জন্মে শুনি নি এমন ইনোভেটিভ অশ্লীল শব্দ-বাক্য-ভঙ্গির ফুলঝুরি। আমরা স্ল্যাং বলতে যা বুঝি, তা এর কাছে দুগুণোপায় শিশু।

এবস্থি অশ্লীলতার ঝড় মেয়েটি প্রতিদিন সামনা করতে বাধ্য হতো। তার ঘরের দুয়োরো বর্বরেরা যত্ন করে ঐকে দিয়ে গেছে তিন কন্যার গাছে বোলানো মৃতদেহ। ওই নিয়েই বাস করছিল মা-মরা মেয়েটা দিদি আর বাবার সঙ্গে। রাত্তায় বেরোলে গালাগালি, টিটকিরি, গায়ে থুতু, মাথার চুল, শাড়ির আঁচল ধরে টানাটানি সহ্য করে ওরা কালপাত করছিল। বাড়িতে কল থাকে না এদের। রাত্তার কল থেকে লাইনে লাগানো বালতি ছুঁড়ে ফেলে দিতো সক্ষমতাগর্বে গর্বিত অন্য পক্ষের ডাকসাইটে মহিলার

বগড়টি বাহিনী। এভাবেই চলছিল, সবাই দেখছিল সবকিছু—মানুষেরও বিবেকবুদ্ধি বটে! ওই তল্লাটের সবাই গুণ্ডা-বদমাশ- অত্যাচারী—এটাই প্রমাণ করা খুব জরুরি হয়ে উঠেছিল? তরুণী ছাত্রী আত্মসম্মানী, অভিমাত্রী গরিব মেয়েটি দেওয়াল লিখনকে মান্যতা দিয়ে ঘরের ভেতরে বুলে পড়লো। এই গল্প আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই।

একটা জিনিস আমার মাথায় এখানো ঢুকছে না, গরিব কী করে গরিবের শত্রুতা করতে পারে! যে তীর ছোঁড়ার কথা ছিল প্রকৃত শত্রুর দিকে তাক করে, কোন্ যাদুতে তার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠলো নিজের সমগোত্রীর দিকে? এ তো মুশল যুদ্ধে যদুবংশ ধ্বংস হবার কাহিনি। গরিবের শত্রু আর দারিদ্র্য নয়, শিক্ষার অভাব নয়, আশ্রয়ের আকুলতা নয়, রোজগারের হাহাকার নয়, একমাত্র শত্রু আশে পাশে এমনকি ঘরে থাকাও সমগোত্রীর মানুষজন। রাজা-বাদশা-সুলতানোরা চমৎকার দাবার খুঁটি সাজিয়েছে—ওরা দল বদলু হয়ে এক-পা এক-পা করে পুরো ছক ময় গর্বিত বোর্ড জুড়ে ঘুরবে, বোড়েগুলো দৌড়ে দৌড়ে লক্ষ লক্ষ করে ‘আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি ছড়োছড়ি’ করে বোকার নৃত্যে সামিল হয়ে নিজেদের কৃতার্থ করে ‘জাতে উঠে যাবার’ নাটকে

নামবে। হ্যাঁ, নামবে। নামছেই। বিনা পয়সায় অটেল চাল ডাল কেরোসিন, লক্ষ্মীভাণ্ডার, বিবিধ ‘শ্রী’ আচ্ছাদিত হবে বিস্তী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা কুঁড়ে হয়ে যাওয়া জনগণ আর চাকরি চাইবে না। চাকরিতে তো খাটতে হবে, বসের ছুকুম মানতে হবে, একটা শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। ওসব হ্যাপার কী দরকার! বেশ তো এই স্থানীয় রাজা-বাদশা-সুলতানদের উমেদারিতে সরকারি সাহায্যগুলো পেছন দরজা দিয়ে লুটো নিতে পারবো। পেছন দরজা দিয়ে যতো লুটপাট সম্ভব, তা কি ওই চাকরির গোনা কটা টাকার ধারে কাছে আসে? মানুষ এখন মাস্তান হবার সাধনায় নিয়োজিত স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সমেত। এবং সবাই জানে, ‘বাবু যতো বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ’, এই সত্যতাকে মান্যতা দিয়েই চতুর্দিকের মাস্তানীবাজি একটু অলি-গলি ঘুরে দেখে আসুন কী চমৎকার চালবাজি সভ্যতার পত্তন আমরা করে ফেলেছি। আত্মহত্যা একা তুহিনা করিনি, চেতনাহীন বোধহীন বিশাল জনগণের গলার দড়ির দাগটা জনসমক্ষে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে। মৃত নাগরিক মৃত জনগণ হাত-পা নেড়ে বাজিগরের ঈশারায় অর্বচীন নৃত্যতালে মেতে রয়েছে।

(চলবে)

—দুয়ের পাতার পর

সরকারি শিক্ষার মৃত্যুঘন্টা

পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি খাতে। দ্বিতীয়ত, রেকারিং ও ননরেকারিং খরচের দায়িত্ব তাদের। তৃতীয়ত, উপযুক্ত মানের শিক্ষক ভাড়া/ জোগাড় / এনগেজ / নিযুক্ত করবে পার্টনার। ভাড়া/যোগাড় এই সব শব্দ ব্যবহার করে একদিকে শিক্ষকদের যেমন অসম্মান করা হয়েছে, অন্যদিকে বোঝা যাচ্ছে সরকার পার্টনার থাকলেও শিক্ষকতা চাকরি ছাটাইযোগ্য হতে চলেছে। সর্বোপরি স্বল্প বেতনে শিক্ষকদের যেমন নিযুক্ত করা যাবে, তেমন একই শিক্ষককে একাধিক স্কুলে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে। এ অভিজ্ঞতা এখন বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বেসরকারি ক্ষেত্রে নেই তা বলা যাবে না। এককথায় এই মোড় শিক্ষায় ‘ঠিকাদারিকরণ’ করবে বললে ভুল বলা হবে? তা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন স্কুল মালিক নিজেরা ‘ক্লাস্টার’ করে স্কুল চালাতেও পারে। সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করবে। চতুর্থত, একই কথা বলা হয়েছে অশিক্ষক কর্মীর ক্ষেত্রে।

স্কুল পরিচালনায় যথেষ্ট সরকারি প্রতিনিধি থাকবে বলা হয়েছে, যদিও তার সংখ্যা ও পার্টনারের প্রতিনিধি সংখ্যা এখন পর্যন্ত বলা নেই। পরে জানানো হবে। শিক্ষক অশিক্ষকের চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কে যা বলা আছে তা হল—প্রথমত, শিক্ষক অশিক্ষক পদ সৃষ্টি করবে স্কুল। নিয়োগের দায়িত্বও তাদের। এর দ্বারা বোঝা যায় পদ সৃষ্টি ও নিয়োগে পার্টনারের গুরুত্বই দেওয়া হয়েছে। মুনাফার স্বার্থে তারা সর্বনিম্ন সংখ্যায় শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করবে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের উল্লেখ নেই। এতে শিক্ষার মান বাড়বে? দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকরির শর্তাবলী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের ভূমিকা কী হবে? সরকার একটি ‘নিয়ন্ত্রক কমিটি’ তৈরি করবে। এই কমিটির ক্ষমতা ও কার্যবলী পরে জানানো হবে।

এই মোড়ে প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে শিক্ষা ও দৈনন্দিন প্রশাসনে সরকারের ‘সর্বনিম্ন’ হস্তক্ষেপ থাকবে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যার অর্থ প্রাইভেট পার্টনারের ‘স্বাধীনতার ডিগ্রী’ই সর্বোচ্চ, সরকারের ‘নিয়ন্ত্রক কমিটি’র ভূমিকা কার্যত ‘আই ওয়াস’? সরকারের সত্যিকারের উদ্দেশ্য হল সমস্ত ধরনের স্কুল অঙ্গনের জমি ও অন্যান্য সম্পদ প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া। শিক্ষার ব্যয়ভার সরকার গ্ৰহণ করবে না। সম্পদ তুলে দিয়ে অর্থ সংগ্রহই সরকারের মূল লক্ষ্য। আর এটি একটি

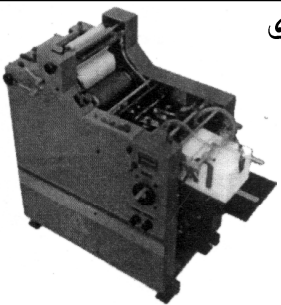
পরিকল্পিত পদক্ষেপ। সেজন্য সরকার কারিগরি শিক্ষা বিভাগ ও সমস্ত পলিটেকনিক, আইটিআই প্রতিষ্ঠানের কাছে জানতে চেয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠানে মোট জমির পরিমাণ, ব্যবহৃত জমি, বিল্ডিং ইত্যাদির তথ্য। ঐ সব প্রতিষ্ঠানে রয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমি, কয়েক হাজার কোটি টাকার বিল্ডিং ও যন্ত্রপাতি। যে জমির অনেকটাই দান করেছেন শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ। মানোন্নয়নের নামে সেই সম্পদ হস্তান্তরে সক্রিয় হয়েছে সরকার। একথা মনে রাখা দরকার শিক্ষায় মানোন্নয়ন মালিকানার ওপর নির্ভর করে না। গুণমান একটা বিমূর্ত এবং আপেক্ষিক বিষয়। শিক্ষার মানোন্নয়ন নির্ভর করে, প্রধানত শিক্ষার উন্নত পরিবেশ ও উন্নত গুণমান সম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী ও তাঁদের কর্মধারার উপর। এছাড়াও শিক্ষা-উপকরণের প্রতুলতা, উন্নত মানের সিলেবাস ও তার ক্রমান্বয়িক সংস্কার ও সরকারের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উপর শিক্ষার মান নির্ভর করে।

স্কুলশিক্ষাই পিপিপি মডেলে প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষায় বিপর্যয়কর বৈষম্য সৃষ্টি হবে। শুধুমাত্র অর্থবান পরিবারের সন্তানরা ওই শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ খসড়া বলা আছে গোটা রাজ্যে এই ব্যবস্থা লাগু হবে। তাছাড়া সব স্তরের শিক্ষায় এই ব্যবস্থা চালু হলে শিক্ষার অধিকার হবে ভুলুপ্ত। শিক্ষক শিক্ষাকর্মী শোষণ সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছাবে। আরো যেটা ভাবা দরকার, মুনাফা-সর্বস্ব ব্যবস্থায় মানোন্নয়নের নিশ্চিতি কোথায়?

এই সমস্ত বিষয় অবহেলা করে সরকার শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে স্কুলশিক্ষার সর্বনাশের দিকে এগুচ্ছে। যে সরকার দান খরচাতে মনোযোগী, শিক্ষার প্রতি যার দৃষ্টিভঙ্গি গোঁণ এবং সন্ধীর্ণ, অপরিবর্তিত খরচ বাড়ানো যে সরকারের ভূষণ, সেই সরকারই উদ্যোগ নিতে পারে জনগণের সম্পদ প্রাইভেট পার্টনারের হাতে তুলে দিতে।

সাধারণ মানুষের কাছে এই কূটকৌশলের স্বরূপ এখনো স্পষ্ট নয়। সমস্ত মানুষকে একাবদ্ধ করে তাদের সাথে নিয়েই এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গিক বিরোধিতা করতে হবে। সরকারি শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারকে সামনের সারিতে নিয়ে যাওয়ার আন্দোলনই আজ আমাদের মৌল কর্তব্য।

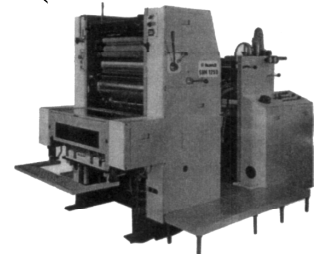
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ



সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com



ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ বা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ বা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা